Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 109-116
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.024

নদীয়া জেলার ঐতিহ্যগত তাঁত শিল্পের শিল্পী সমাজের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রদীপ কুমার সরকার, *গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
সুজয় কুমার মণ্ডল, *প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 29.04.2025; Accepted: 20.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Since the dawn of civilization, folk art has manifested itself through transformations of its most primitive forms. The beauty of folk art, charm, and its unique appeal combine beautifully to give it an expressive aesthetic. Among the traditional artistic streams of folklore, one of the earliest is handloom weaving. The people of India learned to create garments not only with cotton fibres but also by blending them with the exceptional craftsmanship of skilled artisans and their imaginations. This handloom craft carries a legacy of nearly 10,000 years and has continued into the modern era. The handloom industry of Nadia district in West Bengal holds a prominent place globally. The ancient heritage of handloom weaving in Nadia once captivated British rulers. The East India Company and French traders established trading posts in the handloom regions of Nadia and expanded commercial activity. In today's modern context, this industry is on the verge of losing its heritage and is nearing extinction. The handloom industry in areas such as Phulia, Santipur, Habibpur, Nabadwip, Muragacha, and Bethuadahari in Nadia has preserved its artistic identity and heritage. Yet, in the current modern era, the industry is almost disappearing. Socio-economically, the condition of the handloom weavers is deteriorating. Manually operated machines and physical labour have been overshadowed by modern motorized machinery; handloom is replaced by power loom. The traditional handloom industry and artisan communities of Nadia are now in a fragile economic and social state. Once a significant contributor to the GDP of both West Bengal and India, the handloom sector today has nearly vanished from the sphere of foreign trade. In this article, the traditional culture of Nadia district of West Bengal and the present socio-economic and cultural status of the artist society will be discussed.

Keywords: Handloom Weaver, Socio-Economic, Cultural, Folk Art, Heritage

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই, লোকশিল্প তার আদিম রুপের রূপান্তরের মাধ্যেমে নিজেকে আত্ম প্রকাশ করেছে। শতাধিক বছরের বিকশিত স্বকীয় প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি রাজ্যের ঐতিহ্যগত বিষয় হলো তার পরম্পরাগত লোকশিল্প। লোকসংস্কৃতির ধারার অন্যতম উপাদান হলো লোকশিল্প। লোকশিল্প ধারার আর একটি উপাদান হল তাঁতশিল্প বা বয়নশিল্প। সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বিরাজ করে এক শিল্পরূপ, আর এই শিল্পরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার শিল্পকর্মে। মনের বাসনাকে রসমৃশ্রিত করে বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রস্তত করে অসাধারণ শিল্পরূপ। প্রাচীন কালের মানুষ তাদের লজ্জ্বা নিবারণের জন্যে প্রথমে গাছের পাতা, ছাল-বাকল ব্যবহার করলেও কালের পরিবর্তনে তারা লজ্জ্বা নিবারণের জন্যে ছোট কাপড় ও শাড়ির ব্যবহার শুরু

হয়। এই শিল্প ধারা নানান পরিবর্তনের মাধ্যেমে তৈরি হয় হস্ত চালিত তাঁতশিল্প। রেশমের সুতোয় তৈরি এই তাঁতশিল্প পৃথিবীতে আজ সুনামের সাথে শোভিত। এই তাঁতশিল্পের একটি ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান হলো পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা। মোঘল সময়কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কালে নদীয়ার এই তাঁতশিল্প সুনামের সাথে তার ঐতিহ্যগত মৌলিক সত্তা টিকিয়ে রেখেছে। ২০০৮ সালের পরবর্তি সময়ের পর থেকে তাঁত শাড়ির বিকল্প হিসেবে যন্ত্রচালিত মেশিনে তৈরি শাড়ি বাজারে আসতে শুরু করে। এই শাড়ির গুণগতমান তেমন ভালো না থাকা সত্ত্বেও বাজারে এর চাহিদা বেশি, তার কারণ ক্রেতারা খুব কম অর্থের বিনিময়ে এই শাড়ি ক্রয় করতে পারেন। একসময় নদীয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়া অঞ্চলের তাঁত শিল্পের মাকুর আওয়াজ চারিদিকে মুখরিত করে রাখত, কিন্তু আজ এই আধুনিক সময়ের যন্ত্রচালিত মেশিনের ঘটঘট আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতির শিল্প ধারায় লোকশিল্পকলার ইতিহাসে অজস্র লোকজশিল্প বর্তমান, তার মধ্যে অন্যতম একটি শিল্প উপাদান হলো তাঁতশিল্প। লোকশিল্পবলয়ে তাঁত বাংলা তথা ভারতবর্ষে আভিজাত্যপূর্ণ আঙ্গিক রূপে আজও বিরাজমান নদীয়ার তাঁতশিল্প। দেশ ভাগের সময় বাংলাদেশর বিক্রমপুর, টাঙ্গাইল ইত্যাদি জায়াগা থেকে বসাক সম্প্রদায়ের কিছু তাঁতশিল্পীরা নদীয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়া, মুড়গাছা, বেথুয়াডহরি ইত্যাদি জায়গায় বসবাস করতে শুরু করে। এই সম্প্রদায়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ তাঁতশিল্প পেশার সাথে জড়িত। ২০১৫ সালের সময় পর্বে এই তাঁতশিল্পীরা অর্থনৈতিক ভাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে, কারণ হিসেবে শিল্পীরা তুলে ধরেন আধুনিক যন্ত্রচালিত তাঁতের কথা। যেখানে যন্ত্রচালিত তাঁতের মেশিন প্রতি ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ টি শাড়ি বুনতে পারে। আর কায়িক পরিশ্রমে চালিত তাঁত মেশিন থেকে শিল্পীরা দুই দিনে একটি শাড়ি বুনতে সক্ষম হয়ে থাকেন। হস্ত চালিত তাঁতশিল্পের সাথে যে সমস্ত শিল্পীরা প্রত্যেক্ষভাবে জড়িত, সেই সমস্ত শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তেমন ঘটেনি। তাঁতশিল্পীদের হাতের বুননের দক্ষতা ও নিপুণতার স্বাক্ষর এই তাঁতবস্ত্র দেশের সঙ্গে বিদেশেও আধুনিক সময়কালেও ব্যাপক চাহিদার অধিকারী।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য: নদীয়া জেলার তাঁতশিল্প পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের এক অদ্বিতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। এই তাঁতশিল্প শুধু আর্থ-সামাজিক ভাবে গুরুত্ব বহন করে না, বরং বহন করে চিরাচরিত এক গভীরতম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। হস্তশিল্পীর পরম্পরাগত ভাবে একটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। শিল্পীদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের পরম্পরাগত ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা। নদীয়া জেলার তাঁতশিল্পের ইতিহাস প্রায় ১৫০০ বছরের, যা আজও সুনামের সাথে বিশ্বের ইতিহাসে তাঁত বস্ত্রের গুণগত মান বজায় রেখেছে। নদীয়া জেলার তাঁতশিল্পীদের তৈরি মসলিন বস্ত্র এক সময় দেশে-বিদেশে অভিজাত মহলে সুনাম অর্জন করেছিলো। রোম শহর থেকে এই মসলিন শাড়ির বিনিময়ে প্রতি বছর প্রায় লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মূদ্রা ভারত অর্জন করত। এছাড়াও সুলতানি মুঘল যুগে বিখ্যাত মসলিন শাড়ির পাশাপাশি মেঘডমুর, নিলাম্বরী, জামদানি, টাঙ্গাইল প্রভৃতি ঐতিহ্য বহনকারী শাড়ি পরম্পরাগতভাবে লোকশিল্পের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুনামের সাথে বহন করে চলেছে। নদীয়া জেলার তাঁতশিল্প জগতে আরও কয়েক ধরণের ঐতিহ্যগত তাঁত শাড়ির নাম পাওয়া যায় তাহলো- গাঙ্গরী, বৈদিক, খাদমা। গাঙ্গরী শাড়ি নদীয়া জেলার প্রাচীন সুদক্ষ শ্রমিক দ্বারা তৈরি, যা সাধারণত বিভিন্ন সুক্ষ সুতির তন্তু দ্বারা সোনালি, কমলা, লাল রঙ ব্যবহৃত শাড়ী। বৈদিক শাড়ি তুলনামূলকভাবে মসৃণ, যা বাঙ্গালির ঐতিহ্য বহন করে থাকে। খাদমা শাড়ী সুক্ষ ও হালকা হওয়ায় বাঙ্গালী তথা ভারতীয় মহিলাদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিলো এই শাড়ি। ঐতিহ্যগত খাদমা শাড়ি হালকা ও সুক্ষ হওয়ার সুবাদে মহিলারা সহজেই পরিধান করতে পারতেন। খ্রিষ্টীয়

চিত্র নং: ১১০০ কাউন্ট থেকে ৫০০ কাউন্ট বুননে মসলিন শাড়ি
Source: https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার সেন রাজা লক্ষণ সেনের আমন্ত্রণে অধুনা পূর্ব বাংলা থেকে আগত বহু তাঁতশিল্পী নদীয়ার বিভিন্ন জেলায় বসবাস করতে শুরু করে। পূর্ব বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের দক্ষ হাতে তৈরি হয় বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ মসলিন শাড়ি। আঠারো শতকের শেষের দিকে তৈরি ঐতিহ্যপূর্ণ উচ্চমানের মসলিন শাড়ির নাম ছিলো 'মলমল খাস'। এ জাতীয় মসলিন সবচেয়ে সেরা, এই শাড়ি তৈরি হত সম্রাটদের জন্য। আবার কিছু কিছু জায়গায় এই মসলিন শাড়িকে 'গঙ্গাপট্রাহি' শাড়ি নামে অভিহিত ছিলো। ঐতিহ্যগত এই শাড়ি ১০০ কাউন্ট থেকে ৫০০ কাউন্ট পর্যন্ত সুতায় মাপ করে বুনন করা হত। এই 'মলমল খাস' বা মসলিন শাড়ি, যা লম্বায় ছিলো ৪০ ইঞ্চি। দিল্লীর সুলতান ও বাদশাহরা জলপথে ভারতের বাইরে ইউরোপ, আরব, কাবুল, ইতালি, গ্রীক ইত্যাদি দেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতো। ১৭৫৭ সালের পর বাংলার নবাব পরাজিত হলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নদীয়ার, ফুলিয়া ও মুড়াগাছা অঞ্চলের মসলিন শাড়ি ইউরোপ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করতে শুরু করে, এতে কোম্পানি প্রচুর অর্থ-উপার্জন করে বাংলার অর্থ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ফরাসি বণিক দল নদীয়ার বিভিন্ন তাঁতশিল্প অঞ্চলে কুঠির স্থাপন করে বাণিজ্যিক গতিপথ রচনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কোম্পানির বিভিন্ন প্রতিনিধিরা শান্তিপুর, ফুলিয়া, মুড়াগাছা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ১,৭০,০০০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মসলিন সংগ্রহ করে রপ্তানীকার্য পরিচালনা করে। শান্তিপুর ও ফুলিয়া অঞ্চলের তাঁতিদের তৈরি তাঁত শাড়ি, সুতির শাড়ি জগতের এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। কথিত আছে এই মসলিন শাড়ি একটি আংটির মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করানো যেত, তার ঐতিহ্য এখনো থাকলেও গুণগতমান কিছুটা খর্ব হয়েছে বলে শিল্পীদের একাংশের ধারণা। নদীয়ার শান্তিপুরের সূক্ষ সুতো ও সুদক্ষ শ্রমিকের হাতে তৈরি সুতির তাঁত শাড়ি আজও পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ফুলিয়ার টাঙ্গাইল জামদানি শাড়ি তাঁতশিল্প জগতের প্রাচীনতম ঘরনা নির্দেশ করে, যার সুনাম আজও সমগ্র পৃথিবীব্যাপী। নদীয়ার এই তাঁতশিল্প প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করলেও আধুনিক যন্ত্রচালিত (পাওয়ারলুম) তাঁতের কাছে কিছুটা হলেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত সুনাম খর্ব হয়েছে বলে মনে করেন প্রবীণ তাঁতশিল্পীরা। সমস্ত বাঁধা থাকা সত্যেও হস্তচালিত তাঁতশিল্প সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও পরম্পরাগত ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখবে বলে আশা করেন বর্তমান শিল্পী সম্প্রদায়ের একাংশ।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পরম্পরাগত তাঁতশিল্পী বা নদীয়ার তাঁতশিল্পী সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ভর করে তাদের নিজস্ব শিল্প উৎপাদনের চাহিদার উপর। তাঁতশিল্পের তৈরি বিভিন্ন উপাদান যেমন- বিভিন্ন ধরণের সুতির শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, চুড়িদার, রোমাল, চাদর ইত্যাদি শিল্পজাত পণ্য। বর্তমান এই আধুনিক যুগের যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের কাছে হস্তচালিত তাঁতশিল্প প্রতিযোগিতায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রতিটি শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রধান ও দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য তাদের শিল্প সত্ত্বাকে বিশ্বের দরবারে সুনামের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। যখন এই শিল্প দ্রব্য বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন শুরু হবে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা, চাহিদার সাথে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেলেই শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সম্পাদন হবে। শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হলো সেই শিল্পের উন্নয়ন। বর্তমান সময়ের পেক্ষাপটে নদীয়ার তাঁতশিল্পের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন একটি বড় প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পীদের দৈনন্দিন জীবনের গতিপথ রচিত হয় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা একটি সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব দুর্বল জায়গায় অবস্থান করত। এই অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষ ও পূর্ব বাংলা থেকে আগত মানুষদের একটা সময় আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিলো খুবই শোচনীয়। জীবিকা নির্বাহের জন্যে এই অঞ্চলের মানুষেরা পাশ্ববর্তী তাঁতিদের কাছ থেকে তাঁত বোনার কাজ শিখতে শুরু করে। এর পর জীবিকার প্রয়োজনে এই শিল্পকে পেশায় পরিনত করে। শুধু ধর্মীয়ভাবে নয় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই পেশায় আসতে শুরু করে, এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। যার ফল স্বরূপ এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটতে থাকে। শিল্পীদের যখন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে, তখন তাদের পারিবারিক উন্নয়ন ঘটে, সাথে তাদের সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে। এভাবেই একটির সাথে অন্যটির যোগসাধন হয়, এবং তৈরি হয় একটি টেঁকসই উন্নয়ন। বর্তমান সময়ে বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ধারাবাহিকভাবে অবনমন হতে শুরু করছে। যার জন্যে ভেঙ্গে পড়েছে শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

যন্ত্রচালিত তাঁত ২০০৮ সালে, তাঁত বয়নশিল্প কেন্দ্র থেকে প্রথমে ফুলিয়া ও শান্তিপুর অঞ্চলে আসে। পরবর্তী সময়ে এই যন্ত্রচালিত তাঁত প্রতিটি তাঁতশিল্প গ্রামে প্রবেশ করে। হস্তচালিত তাঁতের চাইতে যন্ত্রচালিত তাঁতের মেশিনের ক্রয় মূল্য অনেক বেশি। তাঁত শাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে এই যন্ত্রচালিত তাঁত মেশিন এক ঘন্টায় প্রায় ১০ থেকে ১৫ টি শাড়ি বুনতে সক্ষম হয়ে থাকে। যেখানে হস্ত চালিত তাঁত শ্রমিক একটি শাড়ি তৈরি করতে সময় নিয়ে থাকে একদিন থেকে দুই দিন। যন্ত্রচালিত তাঁতে শ্রমিকের সংখ্যা কম হলেও শাড়ির উৎপাদন সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে থাকে। ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে যন্ত্রচালিত তাঁত ফুলিয়া ও শান্তিপুরে স্থাপিত হয়। কিন্তু যন্ত্রচালিত তাঁত ২০০৮ থকে ২০০৯ সালের সময় পর্বে রাণাঘাট ও হবিবপুর থেকে নদীয়ার বিভিন্ন তাঁতশিল্প গ্রামে ঝড়ের গতিতে স্থাপন হতে শুরু করে। এখন প্রায় নদীয়ার সমস্ত অঞ্চলকে গ্রাস করে ফেলেছে এই যন্ত্রচালিত তাঁত মেশিন। শান্তিপুর, ফুলিয়া, বেথুয়াডহরী, মুড়গাছা তাঁতশিল্প গ্রামগুলি আজ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্ত অঞ্চলের তাঁতশিল্পের প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। নদীয়া জেলায় বসবাসকারী হস্তচালিত তাঁত শ্রমিকেরা মনে করেন, যন্ত্রচালিত তাঁত মেশিন (পাওয়ারলুম) স্থাপিত হওয়ায় তাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এবং নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হস্তচালিত তাঁত এমন একটি কুটিরশিল্প, যার সাথে পরিবারের সদস্যরা যুক্ত থাকে। তাঁতশিল্প পরিবারের এক এক জনের কাজ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যেমন- সুতো পাড়ি, তাঁত বোনা, চরকা কাটা, নলি কাটা, শাড়িতে মার দেওয়া ও শাড়ি ভাজ করার মতো কাজ। বর্তমান সময়ে কম্পিউটারে নক্সা করার জন্য একজন দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন হয়ে থেকে। শিল্পীদের এই কাজের ধরন বিচার করে তার পারশ্রমিক নির্ধারন করা হয়ে থাকে। এই কাজের জন্য বাইরের শ্রমিকের তেমন দরকার হয় না বলে শাড়ি তৈরির পারিশ্রমিকের বেশির ভাগটাই তাঁতশিল্পী পরিবারের মধ্যে থাকে। পাওয়ারলুম স্থাপন হওয়ার পূর্বে হস্তচালিত তাঁতশিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে খুব ভালো স্থানে অবস্থান করতেন। ২০০৮ সালের পরবর্তি সময়ে তাঁতশিল্পের সমস্ত কাজগুলো প্রায় মেশিন দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় শ্রমিকের আর দরকার পড়ে না। এক সঙ্গে অনেকগুলো শাড়ি বুনতে পাড়ায় উৎপাদন খরচ অনেকটাই কম লাগে, যার জন্য তুলনামূলক কম দামে শাড়ি বাজারজাতকরণ করতে পারে। পাওয়ারলুমের শাড়ি খুব অল্প মূল্যে বাজারে বিক্রি করলেও লাভের পরিমাণ অনেকটাই বেশি থাকে। আর যেখানে হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের একটি শাড়ি বুনন করতে প্রায় দুই দিন সময় লাগে। শ্রমিকের মজুরি ও কাঁচামালের দাম একত্রিত করলে উৎপাদন ব্যয় অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। যেখানে হস্ত চালিত তাঁতের উৎপাদন ব্যয়, যন্ত্র চালিত তাঁতের উৎপাদন ব্যয়ের অনেক বেশি। তাই হস্তচালিত তাঁতশিল্পীরা পাওয়ারলুমে তৈরি পণ্যের দামে বাজারজাতকরণ করতে পারছে না। প্রতিযোগিতামূলক বাজরে তাঁতশিল্পীরা তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে না পাড়ায় আর্থ-সামাজিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে। একটি শাড়ি প্রতি শিল্পীরা মজুরি পায় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিন একজন তাঁতশিল্পীর গড়ে পারিশ্রমিক দ্বারায় ১০০ থকে ১৫০ টাকা। এই কম পারিশ্রমিকের জন্য শ্রমিকেরা আর এই পেশায় থাকতে চাইছেন না। তারা এখন পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে কাজের সন্ধানে। রাষ্টপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী বিরেন বসাক এর বক্তব্য অনুযায়ী এই অঞ্চলে ২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত নদীয়া জেলার তাঁত সংখ্যা ছিলো ১,৫০,০০০ হাজারের বেশি। এখন হয়তো ২০২৫ সালে তাঁতের সংখ্যা ৫০,০০০ হাজারের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন একটা সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৯,০০০ থেকে ২০,০০০ হাজার তাঁতশিল্পী এই ফুলিয়া অঞ্চলে এসে কাজ করতেন। এখন হয়তো সেই শিল্পীর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৫০ থেকে ১০০ জনের কাছাকাছি। তিনি আরও বলেন শিল্পীরা কাজ না পেয়ে তাঁত বিক্রি করে দেশের

চিত্র নংঃ ২ রাষ্টপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী বীরেন বসাক

চিত্র নংঃ৩ আনন্দ ঘোষ তাঁতশিল্পী (পরিযায়ী শ্রমিক)

বিভিন্ন প্রান্তে চলে যাচ্ছে। আর এই চলে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ হলো শিল্পীদের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা। তিনি বলেন রাজ্যে সরকার যদি শিল্পীদের ভাতা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও অর্থনৈতিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেন তাহলে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখা দুস্কর হয়ে পড়বে। বর্তমান সময়ে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া, শান্তিপুর, চাকদা ও বেথুয়াডহরীর কিছু জায়গায় তাঁত শাড়ির পাইকারি হাট বসে। তাঁতশিল্পীরা তাদের বুনন তাঁত বস্ত্র এই হাটে নিয়ে আসেন, এবং পাইকারি ও সাধারণ ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। সাধারণত এই হাটে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে হলে মহাজনদের থেকে অনুমতির প্রয়োজন হয়। কারণ এই পাইকারি হাটের দায়িত্ব বা ক্ষমতা থাকে এই মহাজন শ্রেণীর মানুষদের হাতে। শিল্পীরা যদি তাদের তৈরি শাড়ি সরাসরি এই হাটগুলোতে বিক্রি করতে পারে, তাহলে তাদের লাভের পরিমাণ অনেকটাই বেশি হয়। যে সমস্ত শিল্পীরা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহন করে শাড়ি বুনন করে থাকে, সেই সমস্ত শিল্পীরা বাইরে শাড়ি বিক্রি করতে পারে না। কারণ হিসেবে শিল্পীরা জানিয়েছেন মহাজনরা 'পটি' বা দাহন দিয়ে থাকেন, তাই মহাজন ছাড়া শিল্পীরা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ করতে পারবে না। যদি কোন তাঁতি দাদন ছাড়া নিজ অর্থ ব্যয় করে শাড়ি তৈরি করে থাকে, তাহলে সেই তাঁতি তাঁত বস্ত্র অতি সহজে বাজারজাত করতে পারে, যার জন্য তাঁতশিল্পীরা কিছুটা হলেও লাভের মুখ দেখতে পায়। শ্যামনগর থেকে ফুলিয়া এসে কাজ করেন আনন্দ ঘোষ নামে শিল্পী জানান যে কয়েক বছর আগে আমার মালিকের এই কারখানায় ৫ থেকে ১০ জন শিল্পী কাজ করতেন। এখন এই কারখানাতে আমি একাই কাজ করি। তিনি আরও বলেন দুর্গা পুজোর সময় দিন রাত এক করে কাজ করতাম। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ টাকার কাজ করে বাড়ি ফিরতাম। বর্তমান সময়ে আর তেমন আয় হয় না, কোন রকমে সংসার চালিয়ে বেঁচে আছি। এখন আর বাইরে থেকে আমার মতো কোন শিল্পী কাজ করতে আসেন না। তিনি জানান যে কাঁচামালের যে পরিমাণ দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে তাঁত বুনে লাভ হয় না। সরকার যদি কাঁচামালের দাম নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে হয়তো এই শিল্প বেঁচে থাকবে, না হলে কয়েক বছরের মধ্যে এই শিল্পের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বর্তমান সময়ে তাঁতশিল্পীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতিগুলো সমস্ত শিল্পীদের একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই তন্তুবায় সমাবায় সমিতিগুলো উৎপাদনের মূলধনের যোগান ও বিপণন ব্যবস্থার জন্য কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার আয়োজিত হস্তশিল্প মেলায় শিল্পীদের নিয়ে, তাদের উৎপাদিত পণ্যর বাজারজাতকরণ ও বিপণনের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও এই মেলাতে শিল্পীরা তাঁত মেশিন নিয়ে বুনন প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে। এতে ক্রেতারা তাঁত বস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পণ্য ক্রয় করে থাকেন। হস্তশিল্পে মেলার মাধ্যমে শিল্পীরা সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছাতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে শিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই লাভের মুখ দেখতে পায়। সরকার কতৃক হস্তশিল্প মেলায় আগত শিল্পীদের দৈনিক সাম্মানিক প্রদান করে থাকে, ফলস্বরুপ শিল্পীরা মেলার প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। ফুলিয়া, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ তাঁতশিল্প অঞ্চলগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি অনেক তন্তুবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। তন্তুবায় সমিতিগুলো তাঁতশিল্পীদের তৈরি উৎপাদিত পণ্য দেশে ও দেশের বাইরে বিপণনের ব্যবস্থা করে থাকে। পিছিয়ে পড়া শিল্পীদের খুব কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যাগ এবং বস্ত্রদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় উন্নয়ন আধিকারীক (বস্ত্র তাঁত) শান্তিপুর নদীয়া জেলাতে তাঁতশিল্প মেলার আয়োজন করে থাকে। এই মেলাতে আগত তাঁতশিল্পীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে থাকে। রাজ্যে সরকারের এই উদ্যোগ শিল্পীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই ব্যবস্থাপনায় শিল্পীরা একটু হলেও মুনাফার মুখ দেখেছে। উন্নয়ন আধিকারীক (বস্ত্র তাঁত) শান্তিপুর, আয়োজিত কল্যাণীতে বস্ত্র তাঁত মেলার আয়োজন করে। এখানে জেলার অনেক শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই মেলার মাধ্যেমে শিল্পীরা তাদের তৈরি বস্ত্র সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, কারণ কোন মিডিল ম্যান এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। মেলায় আগত তাঁতশিল্পীরা বলেন, তাঁতশিল্পের এই খারাপ সময়ে সরকার যদি এই ধরণের তাঁতশিল্প মেলার আয়োজন করে থাকে, তাহলে শিল্পীরা আর্থ-সামাজিকভাবে লাভবান হয়ে উঠবে।

প্রাচীনকালের দাদন প্রথা আজও এই অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের সাথে জড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি শিল্পীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নতি না হওয়ার জন্যে মহাজনের এই দাদন প্রথা দায়ী বলে জানিয়েছেন শিল্পী সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত মানুষেরা। মহাজনদের কাছ থেকে সুতো, নক্সা (ডিজাইন) এনে শুধু অল্প কিছু মূল্যের বিনিময়ে কাজ করে

থাকেন শিল্পীরা। একটি শাড়ি তৈরির জন্যে শিল্পী পারিশ্রমিক পায় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। এই শাড়ি মহাজন ভোক্তার হাতে তুলে দিচ্ছে প্রায় ২০০০ থেকে ৩০০০ হাজার টাকার বিনিময়ে, যার জন্যে শিল্পীরা কখনো লভ্যাংশের মুখ দেখতে পায় না, লভ্যাংশের বেশির ভাগটাই ভোগ করেন মহাজনেরা।

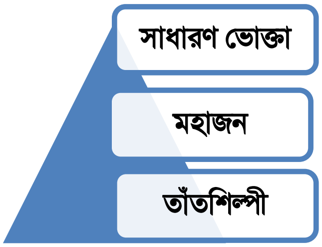

রেখা চিত্র: তাঁতশিল্পী, মহাজন ও সাধারণ ভোক্তার সম্পর্ক

চিত্রের মাধ্যেমে দেখানো হলো তাঁতশিল্পীর তৈরি শিল্প দ্রব্য কিভাবে মহাজন থেকে সাধারণ ভোক্তারদের কাছে পৌছাচ্ছে। তাঁতশিল্পীদের মূল ভিত্তি হলো সুতোর সাহায্য কাপড় বুননের কাজ করা। এই সমস্ত শিল্পীরা সাধারণত গ্রামীণ এলাকাতে বসবাস করে উৎপাদন প্রক্রিয়া কার্যক্রম করে থাকেন। তাঁতশিল্পীরা তাদের শিল্প উপাদান ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে উৎপাদন করে থাকে। শিল্পীদের তৈরি উৎপাদিত কাপড়ের গুণগত মান অনেক সময় সস্তা ও দামি হতে পারে, যা তাদের সরবরাহের চাহিদার উপর নির্ভর করে থাকে। অন্য দিকে মহাজনরা তাঁতশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে না, বরং তারা তাঁতশিল্পীদের তৈরি বস্ত্র বাজারে পৌঁছানোর জন্য ব্যবসায়ী ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীরা সাধারণত বাজার, শহর ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য সরবরাহের কাজ করে। এই সমস্ত মহাজনেরা খুব কম দামে তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে বাজারজাত করে থাকে, ফলস্বরূপ তুলনামূলকভাবে তাঁতশিল্পীদের মুনাফা কম হয়। চিত্রের শেষ পর্যায়ে আছে সাধারণ ভোক্তারা, যারা শিল্পীদের তৈরি পণ্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁতশিল্পের তৈরি উৎপাদিত পণ্য যেমন- শাড়ি, চাদর, গামছা, শাল ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিত হয়। সাধারণ ভোক্তাদের মূল্যবোধ, চাহিদা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে তৈরি পণ্যের দাম নির্ধারণ হয়ে থাকে। ভোক্তা সমাজে কোন ধরণের পণ্যের চাহিদা ও ডিজাইন বেশি আকৃষ্ট তার উপর নির্ভর করে থাকে পণ্যের দাম। এই দাম নির্ধারণের বেশির ভাগ ভূমিকা পালন করে থাকে মহাজন বা মধ্যস্বত্বভোগীরা। যার জন্য লভ্যাংশের খুব কম অংশই ভোগ করে থাকেন তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীরা।

উপরের চিত্রের তিনটি পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়:

- **তাঁতশিল্পী থেকে মহাজন:** তাঁতশিল্পীরা তাদের উৎপাদিত পণ্যকে খুব কম দামে মহাজনের কাছে বিক্রি করে থাকেন। এর পেছনে কারণ হলো শিল্পীদের হাতে তেমন কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকা। বাজারের মধ্যে খুবই শক্তিশালী মধ্যস্বত্বভোগীরা শিল্পীদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে থাকে।
- **মহাজন থেকে ভোক্তা:** মহাজনেরা তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকে খুব কম দামে পণ্য ক্রয় করে অধিক দামে ভোক্তার কাছে বিক্রি করে। মহাজনের এই কর্ম পদ্ধতির লাভ হলো তাঁতশিল্পীর বিক্রির দাম ও সাধারণ ভোক্তার কাছ থেকে নেয়া দামের মধ্যে পার্থক্য।
- **তাতশিল্পী ও ভোক্তা:** তাঁতশিল্পীরা যদি তাদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে তাহলে শিল্পীদের লাভের পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেতে পারে।

তাতশিল্পী, মহাজন ও ভোক্তা এই তিনটি পক্ষের মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত কার্যকারী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে, বর্তমান সময়ে তাঁতশিল্পের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী হতে পারে।

উপসংহার:

তাঁতশিল্পী সমাজে বিভিন্ন সমস্যা আজ প্রায় সর্বত্র বিরাজ করছে। সমস্যার হাত থেকে বাদ যায়নি নদীয়া জেলার ঐতিহ্যময় তাঁতশিল্পী সমাজ। তাঁতশিল্পী সমাজের প্রধান সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। বিশ্বায়নের যুগে তাঁতি সম্প্রদায়ের সামনে অন্ধকার নেমে এসেছে। বিশ্বায়নের যুগে খোলা হাট-বাজারে মুক্ত অর্থনীতিতে ঢুকে যাচ্ছে

বিদেশী পণ্য ও বিদেশী পুঁজি। আধুনিকতা ও বিশ্বায়ন এক সাথে পাল্লা দিয়ে পুরনো ঐতিহ্যকে গ্রাস করে ফেলেছে। আধুনিক যন্ত্রের কাছে মান্ধাতা আমলের যন্ত্র মাথানত করেছে। অনেক সময় শিল্পীরা আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী কার্যকরভাবে পণ্য উৎপাদন করতে পারে না, যার ফলে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার অবস্থানে দুর্বল হয়ে পড়ে। বলা যায় হাতে টানা তাঁত পিছিয়ে আছে যন্ত্র চালিত পাওয়ারলুমের কাছে। শিল্পীদের আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবস্থা করা ও তাদের হাতে তুলে দিতে হবে আধুনিক যন্ত্র। তাহলে এই শিল্পের ঐতিহ্য ফিরে পাওয়া যাবে। রাজ্যে সরকারের প্রচারের পাশাপাশি আয়োজন করতে হবে তাঁতশিল্প মেলা। যেখানে শিল্পীরা তাদের বুননজাত পণ্য সহজেই বিক্রি করতে পারবে। সরকারি নানান রকম ভূর্তকির জন্য এই তন্তুবায় শিল্প আজও টিকে আজে এই বিশ্বায়নের বাজারে। মুক্ত অর্থিনীতিতে সরকার তুলে নেবে তার অনুদান, তুলে নেবে শিল্পীদের সুযোগ সুবিধা। তখনই শুরু হবে এই শিল্পের মরণ-দশা। বর্তমান সময়ে শিল্পীদের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ একদিন মাথানত করবে পাওয়ারলুমের কাছে। নদীয়ার তাঁতশিল্প এলাকায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন সমাবায় সমিতিকে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থার পাশাপাশি উন্নত ট্রেনিং এর ব্যবস্থ করতে হবে। তাহলে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আজ প্রায় দূর্লভ, তার মূল কারণ বিশ্বায়ন। সরকারের উদাসীনতা এই তাঁতশিল্পকে ঠেলে দিয়েছে বিপদের মুখে। মহাজনি প্রথা ও তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার তাঁতশিল্প ধ্বংসের জন্য যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী তাদের প্রাচীন দাদন প্রথা। শিল্পীদের লভ্যাংশের বেশির ভাগটাই চলে যায় মহাজন শ্রেণীর পকেটে, যার জন্য শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পিছিয়ে আছে। তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী দক্ষ শ্রমিক। দক্ষ শ্রমিক পাওয়া আজ প্রায় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁত শ্রমিকেরা প্রতিদিন যে মজুরি পান, তাতে তাদের সংসার চালানো দুস্কর হয়ে পড়ে। তাই দক্ষ শ্রমিকেরা বেশি টাকার লোভে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। প্রতি বছর বাইরে থেকে যে শ্রমিকেরা নদীয়ায় আসতেন তাঁত বুনতে, এখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এই শিল্প থেকে। তাদের হাতের সুক্ষ বুনন দক্ষতা আর যেখা যায় না এই জেলাতে। ফুলিয়া, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ ইত্যাদি জায়গায় তাঁতের খট, খট শব্দের আওয়াজ আধুনিক যন্ত্রের আওয়াজে চাপা পড়ে যাচ্ছে। নদীয়া জেলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান এক সময় ছিলো স্বর্ণ শিখরে। শিল্পীরা যদি আর্থ-সামাজিকভাবে সমৃদ্ধ হয় তাহলে বেঁচে থাকবে তাঁতশিল্প, সংস্কৃতি ও প্রাচীন ঐতিহ্য। আজ এই শিল্প হাড়িয়ে যাচ্ছে, হাড়িয়ে যাচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্য। এই তাঁতশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শিল্পীদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে অর্থ, দিতে হবে সম্মান ও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা। না হলে নদীয়ার প্রাচীনতম ঐতিহ্য আধুনিক কালের গ্রাসে চিরতরে মুছে যাবে নদীয়া জেলা থেকে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গুপ্ত, ক্ষেত্রমোহন। বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি। কলকাতা, ভারত: পুস্তক বিপণি, ২০০২।
২. দৌলত, সেখ। মুড়াগাছা অঞ্চলের তাঁত শিল্প ও শিল্পী সমাজ। কল্যাণী, ভারত: লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
৩. বিশ্বাস, সুজিত। তাঁত শিল্পের বিবর্তনে নদীয়া জেলা সমীক্ষা। কলকাতা, ভারত: অরুণা প্রকাশন, ২০০৯।
৪. সাঁতরা, তারাপদ। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পিসমাজ। কলকাতা, ভারত: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০।

Website:

1. https://www.anandabazar.com/editorial/handloom-labours-of-shantipur-are-at-a-fix-1.1035973
2. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8

তথ্যদাতা:

১. বীরেন বসাক (রাষ্টপতি পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁতশিল্পী), চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া।
২. শিবনাথ বসাক, (তাঁতশিল্পী) চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া।
৩. আনন্দ ঘোষ, (পরিযায়ী তাঁতশিল্পী) শ্যামনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা।
৪. মোজাম্মেল হক,(তাঁতশিল্পী) বেথুয়াডহরী, নদীয়া।
৫. স্বপন রাজবংশী, (তাঁতশিল্পী) মোড়তলা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান।
৬. মোতালেপ শেখ, (তাঁতশিল্পী) বেথুয়াডহরী, নদীয়া।
৭. রবীন্দ্রনাথ বসাক,(তাঁতশিল্পী) চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া।
৮. নিতাই বসাক, (তাঁতশিল্পী) চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া।
৯. সনাতন বিশ্বাস, (তাঁতশিল্পী) শান্তিপুর, নদীয়া।
১০. সুভেন্দ বিশ্বাস, (তাঁতশিল্পী) শান্তিপুর, নদীয়া।